জিরো

অধ্যায় সাত

পরম শূন্য

[পদার্থবিদ্যায় শূন্য]

গণিতে কোনো রাশি অতিশয় বড় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলে নয়, বরং রাশি ছোট হলে তাকে উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ। — পল ডিরাক

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অসীম আর শূন্য অবিচ্ছেদ্য। গণিতের অপরিহার্য অংশ। গণিতবিদরা বুঝলেন, এদেরকে সাথে নিয়েই চলতে হবে। তবে পদার্থবিদদের কাছে মনে হচ্ছিল, মহাবিশ্বের কাজকর্মে শূন্যের কোনো ভূমিকা নেই। অসীমকে যোগ করা ও শূন্য দিয়ে ভাগ করা গণিতের কাজ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি এভাবে কাজ করে না।

বিজ্ঞানীরা অন্তত এমনটাই আশা করেছিলেন। একদিকে গণিতবিদরা শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন। ওদিকে শূন্য গণিতের চৌহদ্দি পেরিয়ে চলে এল পদার্থবিদ্যায়। তাপগতিবিদ্যায় (thermodynamics) শূন্য হয়ে গেল অনতিক্রম্য এক বাধা। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় শূন্য হয়ে গেল কৃষ্ণগহ্বর। দানবীয় যে তারা গিলে খায় বহু নক্ষত্র। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় শূন্য শক্তির এক অদ্ভুত উৎস। গভীরতম ভ্যাকুয়ামেও (শূন্যস্থান) আছে যার উপস্থিতি। তৈরি করে এক ভূতুড়ে বল, যার নেই কোনো উৎস।

শূন্য তাপ

পরিমাপের বিষয়কে সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে এটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কিন্তু একে পরিমাপ করা না গেলে ও সংখ্যায় প্রকাশ করা না গেলে জ্ঞান থাকে নগণ্য ও অতৃপ্তিদায়ক। হয়তোবা এটা জ্ঞানের সূচনা। তবে এসব চিন্তা আপানকে বিজ্ঞানের পথে বেশিদূর অগ্রসর করেনি। — উইলিয়াম থমসন, লর্ড কেলভিন

পদার্থবিদ্যায় শূন্যের প্রথম অনিবার্য উপস্থিতি দেখা যায় অর্ধশতক ধরে ব্যবহৃত একটি সূত্রে। ১৭৮৭ সালে ফরাসি পদার্থ জাক সূত্রটা আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন বেলুনে উড়ে তিনি ততদিনে এমনিতেই বিখ্যাত। তবে উড্ডয়ন তেলেসমাতির জন্য নয়, তিনি ইতিহাসে অমর হন তাঁর নামে নাম দেওয়া সূত্রটার (শার্লের সূত্র) কারণে।

গ্যাসের নানান ধরনের বৈশিষ্ট্য সমকালীন অনেক পদার্থবিদের মতো শার্লকেও অভিভূত করে। অক্সিজেন কয়লাকে শিখায় পরিণত করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আবার তাকে নিভিয়ে দেয়। প্রাণঘাতী ক্লোরিনের রং সবুজ। নাইট্রাস অক্সাইডের নেই রং, তবে মানুষ হাসাতে ওস্তাদ। তবে আলাদা আলাদা এ গ্যাসগুলোর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য একইরকম। তাপ দিলে এরা প্রসারিত হয়। আর ঠাণ্ডা করলে হয় সঙ্কুচিত।

শার্লে আবিষ্কার করেন, এ আচরণ অত্যন্ত নিয়মিত ও অনুমানযোগ্য। যেকোনো দুটি আলাদা গ্যাস সমান পরিমাণে নিন। রাখুন একই ধরনের বেলুনের ভেতরে। তাদেরকে একই পরিমাণ তাপ দিন। দেখবেন, তারা সমান প্রসারিত হচ্ছে। ঠাণ্ডা করলেও একইসমান সঙ্কুচিত হচ্ছে। এছাড়াও তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি বাড়া বা কমার জন্য আয়তনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাড়বে বা কমবে। শার্লের সূত্র থেকে গ্যাসের তাপমাত্রা ও আয়তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

তবে ১৮৫০-এর দশকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন শার্লের সূত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। সমস্যাটা শূন্য নিয়ে। তাপমাত্রা কমালে বেলুনের আয়তন ক্রমেই কমতে থাকে। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হারে কমাতে থাকলে বেলুনও নির্দিষ্ট হারে চুপসে যেতে থাকবে। তবে সেটা চিরকাল সম্ভব নয়। তাত্ত্বিকভাবে এমন একটি বিন্দু আছে, যেখানে গ্যাস কোনো জায়গায়ই দখল করে না। শার্লের সূত্র বলে, একটি গ্যাস বেলুন চুপসে গিয়ে অবশ্যই শূন্য পরিমাণ স্থান দখল করবে। নিঃসন্দেহে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য আয়তন শূন্য। এ বিন্দুতে পৌঁছে গ্যাস আর কোনো জায়গা দখল করে না। (অবশ্যই গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হতে পারে না।) গ্যাসের আয়তন এর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত বিধায় সর্বনিম্ন আয়তন থাকলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও থাকবে। একটি গ্যাস অনন্তকাল ধরে শীতল হতে থাকবে—সেটা সম্ভব নয়। একটা সময় বেলুনকে আর ছোট করা না গেলে তাপমাত্রাও আর কমানো যাবে না। এটাই পরম শূন্য। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। যার মান পানির হিমাঙ্কের নিচে ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটু বেশি। অন্য কথায় (-২৭৩) ডিগ্রি সেলসিয়াস১।

থমসন অর্ড কেলভিন নামেই বেশি পরিচিত। আর কেলভিনের নামেই তাপমাত্রার সার্বজনীন স্কেলের নাম দেওয়া হয়েছে। সেলসিয়াস স্কেলে শূন্য ডিগ্রি হলো পানির হিমাঙ্ক। যে তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয়। কেলভিন স্কেলে শূন্য হলো পরম শূন্য।

পরম শূন্য অবস্থায় এক পাত্র গ্যাসের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বাস্তবে এটা কখনোই করা যাবে না। একটা বস্তুর তাপমাত্রা কমিয়ে কখনোই পরম শূন্য করা যাবে না। তবে খুব কাছাকাছি যাওয়া যাবে। একটি উপায়ের নাম লেজার কুলিং। এক ডিগ্রিকে কয়েক লক্ষ ভাগ করলে যা হবে, এ পক্রিয়ায় পরম শূন্যের ততটা কাছাকাছি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তবে ঐ বিশেষ বিন্দুটিতে পৌঁছতে চাইলে মহাবিশ্বের সবকিছু একজোট হয়ে বাধা দেবে। কারণ শক্তি আছে এমন যেকোনো কিছু এদিক-সেদিক লাফাবে। আলো বিকিরণ করবে। যেমন মানুষের দেহের উপাদান নিয়ে ভাবুন। কিছু পানির অণু ও কিছু জৈব মিশ্রণ দিয়ে আমরা গঠিত। এই সবগুলো পরমাণু স্থানের মধ্যে এদিক-সেদিক লাফাচ্ছে। তাপমাত্রা যত বেশি হবে, লাফাবে তত দ্রুত গতিতে। লাফিয়ে বেড়ানো এ অণুগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। লাফাতে বাধ্য করে পার্শ্ববর্তী অণুকেও।

ধরুন আমরা একটি কলার তাপমাত্রা পরম শূন্য করতে চাই। কলা থেকে সব শক্তি বের করে নিতে হলে এর পরমাণুগুলোর নড়াচড়া থামাতে হবে। একটি বক্সে রেখে কমাতে হবে এর তাপমাত্রা। তবে বক্সটাও তো পরমাণু দিয়েই তৈরি। সে পরমাণুও লাফাচ্ছে। তারা কলার পরমাণুকেও ধাক্কা দেবে। নড়িয়ে দেবে তাদেরকে। বাধ্য করবে লাফাতে। বক্সের কেন্দ্রে একটি নিখুঁত ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সেখানে কলাকে ভাসিয়ে রাখলেও কলার কণারা নড়াচড়া করবে। কারণ চলনশীল কণা আলো বিকিরণ করে। বক্স থেকে প্রতি মুহূর্তে আলো বের হচ্ছে। যা ধাক্কা দেবে কলার অণুকে। বাধ্য করবে চলাচলে।

রেফ্রিজারেটরের কয়েলের টুইজারের সবগুলো পরমাণু নড়ছে আর বিকিরণ দিচ্ছে। একই কাজ করছে এক পাত্র তরল নাইট্রোজেনের পরমাণুরা। ফলে বক্সের কম্পন ও বিকিরণ থেকে কলা প্রতিনিয়ত শক্তি শোষণ করছে। শক্তি নিচ্ছে টুইজার ও রেফ্রিজারেটরের কয়েল থেকে। বক্স থেকে কলাকে বর্ম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয়। নয় টুইজার বা কয়েল থেকে। সেই বর্মও নড়ছে ও বিকিরণ দিচ্ছে। প্রতিটি বস্তু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। অতএব, মহাবিশ্বের যেকোনো কিছুর তাপমাত্রা পরম শূন্যে নিয়ে আসা অসম্ভব। চাই সেটা কলা, বরফখণ্ড কিংবা খাবারের টুকরো হোক। এটা এল অনতিক্রম্য বাধা।

পরম শূন্যের আবিষ্কারের প্রভাব নিউটনের সূত্রের চেয়ে একদম ভিন্ন। নিউটনের সূত্রগুলো পদার্থবিদদের দেয় ক্ষমতা। এদের মাধ্যমে গ্রহের কক্ষপথ ও বস্তুর গতির পূর্বাভাস দেওয়া যায় খুব নির্ভুলভাবে। ওদিকে কেলভিনের পরম শূন্যের আবিষ্কার পদার্থবিদদের বলল, কী তারা করতে পারবে না। পরম শূন্যে কখনও পৌঁছা সম্ভব নয়। পদার্থবিদদের কাছে এ বাধা ছিল এক হতাশাজনক বাধা। তবে এর মাধ্যমে শুরু হয় তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) নামে পদার্থবিদ্যার নতুন এক শাখা।

তাপগতিবিদ্যায় তাপ ও শক্তির আচরণ নিয়ে কাজ করা হয়। কেলভিনের পরম শূন্যের আবিষ্কারের মতো তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো একটি অনতিক্রম্য দেয়াল খাড়া করল, যা অতিক্রম করা শতচেষ্টার পরেও কোনো পদার্থবিদের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই যেমন তাপগতিবিদ্যা বলে, অবিরাম-গতি যন্ত্র বানানো অসম্ভব। উৎসাহী আবিষ্কারকরা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ও বিজ্ঞান ম্যাগাজিনে অসাধারণ এ যন্ত্রের নকশা পাঠাতে লাগলেন। যে যন্ত্র কোনো শক্তি ছাড়াই চিরকাল চলতে পারে। তবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র বলি মন যন্ত্র বানানো অসম্ভব। এটা আরেকটি কাজ, যা করা সম্ভব নয়। এমন যন্ত্রও বানানো সম্ভব নয়, যা কোনো শক্তি অপচয় না করেই চলতে পারে। তাপ আকারে কিছু শক্তি অপচয় হিসেবে মহাবিশ্বে যোগ হয়ে যাবেই। (তাপগতিবিদ্যা ক্যাসিনোর চেয়ে খারাপ। যত চেষ্টাই করুন, আপনি জিততে পারবে না। আপনি পাবেন না নিজের পুঁজিটাও।)

তাপগতিবিদ্যা থেকে এল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা (statistical mechanics) নামক শাখা। এক গুচ্ছ পরমাণুর সামষ্টিক গতি দেখে পদার্থবিদরা পদার্থের আচরণের পূর্বানুমান করতে পারেন। যেমন গ্যাসের পরিসংখ্যানিক বিবরণই শার্লের সূত্রের ব্যাখ্যা দেয়। গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে অণুরা গড়ে দ্রুত থেকে আরও দ্রুত চলাচল করে। পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দেয় জোরে জোরে। ফেল গ্যাস দেয়ালে জোরে ধাক্কা দেয়। চাপ বাড়তে থাকে। কণার নড়াচড়ার তত্ত্ব পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করল। এমনকি মনে হচ্ছিল, এটি আলোর প্রকৃতিরও ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।

আলোর প্রকৃতির সমস্যা বিজ্ঞানীদের বহু শতাব্দী পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। আইজ্যাক নিউটন মনে করতেন, আলো তৈরি কণা দিয়ে। যে কণা নির্গত হয় সব উজ্জ্বল বস্তু থেকে। তবে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, আলো কণা নয় বরং তরঙ্গ। ১৮০১ সালে একজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ আবিষ্কার করেন, আলো নিজের সাথে ব্যতিচার করে। দেখে মনে হলো, আলোর কণাধর্ম চিরতরে বাতিল হয়ে গেল।

সব ধরনের তরঙ্গেই ব্যতিচার হয়। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে বৃত্তাকার ঢেউ বা তরঙ্গ তৈরি হয়। পানি ওপরে-নিচে দোল খায়। আর বৃত্তাকার ভঙ্গিতে তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজ বাইরের দিকে চলতে থাকে। একইসাথে দুটি ঢিল ছুঁড়লে একে অপরের সাথে ব্যতিচার করে। একটি পাত্রে দুটি স্পন্দনশীল পিস্টন ডোবালেও এটা দেখা যাবে। এক পিস্টনের চূড়া আরেক পিস্টনের খাঁজের সাথে মিলিত হলে একে অপরকে বাতিল করে দেয়। ঢেউয়ের নকশায় ভাল করে চোখ রাখলে নিশ্চল তরঙ্গহীন পানি দেখা যাবে (চিত্র ৪৫)।

আলোর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। দুটি ছিদ্র আলো প্রবেশ করলে অন্ধকার ও তরঙ্গহীন অঞ্চল তৈরি হয় (চিত্র ৪৬)। (বাসায় বসেই অনেকটা একইরকম একটি চিত্র আপনি দেখতে পারেন। দুই আঙ্গুলকে এক করে ধরুন। মাঝে থাকবে সামান্য ফাঁক, যেখান দিয়ে আলো চলাচল করতে পারবে। সে ফাঁক দিয়ে আলোর দিকে তাকান। দেখবেন কিছু অন্ধকার রেখার উপস্থিতি। বিশেষ করে ফাঁকের উপর ও নিচের দিকে। এসব রেখাও আলোর তরঙ্গবৈশিষ্ট্যের ফল।) তরঙ্গ এভাবেই ব্যতিচার ঘটায়। কণারা তা করে না। ফলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ব্যতিচারের ঘটনা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে সব বিভ্রান্তির সমাধান করে ফেলল। পদার্থবিদরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আলো কোনো কণা নয়। বরং তড়িৎ ও চুমকক্ষেত্রের তরঙ্গ।

১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটাই ছিল সবচেয়ে আধুনিক ধারণা। পরিসংখ্য্যানিক গতিবিদ্যার সাথে এটি পুরিপূর্ণরূপে মিলে যাচ্ছিল বলেই মনে হচ্ছিল। পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা বলে দেয় বস্তুর অণুরা কীভাবে লাফায়। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব বলল, এই আণবিক কম্পন কোনোভাবে বিকিরণের ঢেউ বা আলোকতরঙ্গ তৈরি করে। এর চেয়ে ভাল কথা হলো, একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর অণুরা তত দ্রুত লাফায়। একইসাথে একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর আলোর ঢেউয়ের শক্তি তত বেশি হয়। একদম নিখুঁত ভাবনা। আলোর তরঙ্গ যত দ্রুত উঠা-নামা করবে, এর কম্পাঙ্ক তত বেশি। (আবার কম্পাঙ্ক যত বেশি, তরঙ্গের দুই চূড়ার মাঝের দূরত্ব বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম।) তাপগতিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র স্টেফান-বোলজম্যান সমীকরণ। এ সমীকরণ আলোর কম্পনকে অণুর কম্পনের সাথে জোড়া দেয়। এটা থেকে বস্তুর তাপমাত্রার সাথে এর বিকিরিত মোট শক্তির পরিমাণের সম্পর্ক পাওয়া যায়। এটাই ছিল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা ও আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের সবচেয়ে বড় বিজয়। (এ সমীকরণ বলে, বিকিরিত শক্তি তাপমাত্রা চুতুর্থ ঘাতের সমানুপাতিক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি প্রদান করলে একটি বস্তু কী পরিমাণ বিকিরণ নির্গত করবে। পাশাপাশি এও বলে দেয়, বস্তুটি কতটা উত্তপ্ত হবে। পদার্থবিদ্যার এ সূত্র ও বাইবেলের ইসাইয়া পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদ কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদরা হিসাব করেছিলেন, স্বর্গের তাপমাত্রা ৫০০ ডিগ্রি কেলভিনের বেশি।

চিত্র ৪৫: পানিতে ব্যতিচারের দৃশ্য

চিত্র ৪৬: আলোর ব্যতিচার। বইটাকে পাশে ঘুরিয়ে পৃষ্ঠা বরাবর তাকালে ব্যতিচার নকশা দেখা যাবে।

তবে এ বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হলো না। শতাব্দী পার হলে দুজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ তরঙ্গ তত্ব কাজে লাগিয়ে একটি সরল সমস্যা সমাধান করতে চাইলেন। হিসাবটা মোটামুটি সোজাসাপ্টাই ছিল। তাঁরা বের করতে চাইলেন, একটি ফাঁকা গর্ত কতটুকু আলো বিকিরণ করে। ব্যবহার করলেন পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার মৌলিক সমীকরণ। যা বলে দেয়, অণুরা কতটুকু লাফালাফি করে। পাশাপাশি ব্যবহার করলেন তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ার সমীকরণ, যা বলে দেয়, আলো কীভাবে লাফায়। এর মাধ্যমে তাঁরা পেলেন আরেকটি সমীকরণ। যা বলে দিল, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গর্তের আলো কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণ দেবে।

দুই পদার্থবিদ লর্ড রেলি ও জেমস জিন্সের নামে এ সমীকরণের নাম রেলি-জিন্স সূত্র। বেশ ভাল কাজ করছিল সূত্রটা। উত্তপ্ত বস্তু থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম শক্তির আলোর পরিমাণ বের করতে সূত্রটা ভালোভাবে কাজ করছিল। কিন্তু উচ্চশক্তিতে সমীকরণটা ভুল ফল দিয়ে ফেলে। রেলি-জিন্স সূত্র বলে, একটি বস্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ক্রমেই বেশি করে আলো নির্গত করতে থাকে। ফলে শক্তিও বেশি বেশি নির্গত করে। ফলে শূন্যের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বস্তুটি অসীম পরিমাণ উচ্চশক্তির আলো প্রদান করে। রেলি-জিন্স সমীকরণ অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরিত করছে। এটা বস্তুর তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না। এমনকি একটি বরফখণ্ডও প্রচুর পরিমাণ অতিবেগুনি, এক্স ও গামা রশ্মি বিকিরিত করে। যা দিয়ে চারপাশে সবকিছুকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এ সমস্যার নাম ছিল অতিবেগুনি বিপর্যয়। শূন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য অসীম শক্তির সমান। এক গুচ্ছ সুন্দর সূত্রকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছিল শূন্য ও অসীম। এ সমস্যার সমাধান শীঘ্রই পদার্থবিদ্যার প্রধান ধাঁধাঁ হয়ে গেল।

রেলি ও জিন্স ভুল কিছু করেননি। তারা যে সমীকরণ ব্যবহার করেছেন, পদার্থবিদরা যাকে সঠিক মনে করতেন। সমীকরণ নিয়ে কাজ করেছেন নিয়ম মেনেই। কিন্তু যে উত্তর পেলেন তা বাস্তব বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরফখণ্ড গামা রশ্মি দিয়ে সভ্যতা ধ্বংস করে না। যদিও সেসময়ের পদার্থবিদ্যার সূত্র এমন ফলাফলের দিকে ঠেলে দেয়। পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকে তো তাহলে ভুল হতেই হবে। সেটি কোনটি?

কোয়ান্টাম শূন্য: অসীম শক্তি

পদার্থবিদরা মনে করেন ভ্যাকুয়ামের মধ্যে সব কণা ও বল সুপ্ত আছে। দর্শনের শূন্যের চেয়ে এটা অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

— স্যার মার্টিন রিজ

অতিবেগুনি বিপর্যয় থেকে জন্ম কোয়ান্টাম বিপ্লবের। আলোর চিরায়ত তত্ত্ব থেকে শূন্যকে বিদায় করল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুখণ্ড থেকে বের হওয়া অসীম শক্তি দূর হলো। তবে এটা তেমন বড় কোনো বিজয় ছিল না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় শূন্যের অর্থ হলো পুরো মহাবিশ্ব—এমনকি ভ্যাকুয়ামেও আছে অসীম পরিমাণ শক্তি। এর নাম শূন্য-বিন্দু শক্তি। আর এ থেকেই মহাবিশ্বের সবচেয়ে অদ্ভুত শূন্যের উৎপত্তি। শূন্যতার ভূতুড়ে শক্তি।

১৯০০ সালে জার্মান পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীরা অতিবেগুনি বিপর্যয় নিয়ে জানার চেষ্টা করেন। তারা নিবিড়ভাবে পরিমাপ করলেন, বিভিন্ন তাপমাত্রায় একটি বস্তু থেকে কী পরিমাণ বিকিরণ বের হয়। দেখা গেল, রেজি-জিন্স সূত্র দিয়ে আসলে বস্তু থেকে আসা আলোর সঠিক পরিমাণ বের করা যায় না। তরুণ পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নতুন উপাত্ত তলিয়ে দেখলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি করলেন নতুন একটি সমীকরণ। রেলি-জিন্স সূত্রকে হটিয়ে জায়গা দখল করল এ সমীকরণ। প্ল্যাঙ্কের সূত্র নতুন পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলো। তারচেয়ে বড় কথা হলো, সমাধান করল অতিবেগুনি বিপর্যয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে প্ল্যাঙ্কের সূত্র লাফ মেরে অসীমে চলে গেল না। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে শক্তি বড় থেকে আরও বড় হওয়ার বদলে কমতে থাকল (চিত্র ৪৭)। তবে দূর্ভাগ্য পিছু লেগেই রইল। প্ল্যাঙ্কের সূত্র ঠিকই ছিল। তবে এর পাল্টা আঘাতখানি এর সমাধান করা অতিবেগুনি বিপর্যয়ের চেয়ে ঝামেলাপূর্ণ।

চিত্র ৪৭: রেলি-জিন্স সূত্র অসীমের দিকে নিয়ে যায়। তবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র সসীম থাকে।

সমস্যা সৃষ্টির কারণ, প্ল্যাঙ্কের সূত্র পদার্থবিদ্যার পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার সাধারণ অনুমান (assumption) থেকে আসেনি। প্ল্যাঙ্কের সূত্র তৈরি করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার সূত্রে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। প্ল্যাঙ্ক পরে বলেছিলেন, কাজটি তিনি করেছেন মরিয়া ও বেপরোয়া হয়ে। কারণ বেপরোয়া না হলে একজন পদার্থবিদ পদার্থবিদ্যার সূত্রে এমন দৃশ্যত খামখেয়ালী কাজ করবেন না। প্ল্যাঙ্কের মতে, অণুদের জন্য বেশিরভাগ পথে চলাচল নিষিদ্ধ। কোয়ান্টা নামে শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্বীকৃত শক্তিতে তারা কম্পিত হতে পারে। এই স্বীকৃত মানের মাঝামাঝি অন্য কোনো মান থাকার এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটাকে অদ্ভুত কোনো অনুমান মনে নাও হতে পারে। তবে বিশ্বকে দেখে এভাবে কাজ করে বলে মনে হয় না। প্রকৃতি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না। পাঁচ ফুট আর ছয় ফুটের মাঝামাঝি উচ্চতার কোনো মানুষ থাকবে না—এমনটা ভাবা বোকামি। একটা গাড়ি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলবে, অথবা ৪০ মাইল, কিন্তু ৩৩ বা ৩৮ মাইলে চলবে না—এটা অদ্ভুত কথা। তবে কোয়ান্টাম গাড়ি ঠিক এভাবেই চলে। হয়তো আপনি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলছেন। কিন্তু অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেই বুম! পৌঁছে যাবেন ৪০ মাইল বেগে। এর মাঝে কোনো বেগ নেই। ফলে ৩০ থেকে ৪০-এ যেতে হলে আপনাকে দিতে হবে *কোয়ান্টাম লাফ*। একইভাবে কোয়ান্টাম মানুষ এত সহজে বড় হতে পারে না। কয়েকবছর তারা থাকবে চার ফুট লম্বা। এরপর হঠাৎ করে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে বুম! উচ্চতা হয়ে যাবে পাঁচ ফুট২। কোয়ান্টাম অনুকল্প আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব অভিজ্ঞার বিপরীত।

প্রকৃতির কাজের সাথে বিপরীতধর্মী মনে হলেও প্ল্যাঙ্ক বললেন, আণবিক কম্পন কোয়ান্টায়িত। তবে এ অদ্ভুত অনুকল্পের মাধ্যমেই পাওয়া গেল বস্তু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্কের সঠিক সূত্র। সূত্রটা যে সঠিক তা বুঝতে পদার্থবিদদেরও সময় লাগেনি। কিন্তু তবু তারা কোয়ান্টাম অনুকল্প মেনে নেননি। কথাটা যে বড় বেশি অদ্ভুত!

কোয়ান্টাম অনুকল্পকে অদ্ভুত ধারণা থেকে স্বীকৃত সত্যে রূপ দেন এমন একজন মানুষ যার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। প্যাটেন্ট অফিসের ২৬ বছর বয়স্ক এক কেরানি। তিনিই পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বকে দেখালেন, প্রকৃতি মসৃণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, কাজ করে কোয়ান্টায়। পববর্তীতে নিজের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ তত্ত্বের প্রধান বিরোধীও হন তিনি নিজেই।

আইনস্টাইনকে দেখে মোটেও বৈপ্লবিক মনে হয়নি। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যখন পদার্থবিজ্ঞান জগতে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আইনস্টাইন তখন চাকরি খুঁজতে জুতার তলা ক্ষয় করছিলেন। অর্থের ওভাবে পড়ে সুইশ প্যাটেন্ট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরি নেন। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির চেয়ে যা অনেক নিম্নমানের। ১৯০৪ সালের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ও পুত্রসন্তানের বাবা হন। প্যাটেন্ট অফিসে খেটে মরছেন। মহান কিছু করার পথ কালেভদ্রে হয় এমন। কিন্তু ১৯০৫ সালের মার্চের তিনি এমন একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। এ গবেষণাপত্রে তিনি আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার (photoelectric effect) ব্যাখ্যা দেন। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও সবার নজর কাড়ে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বীকৃতি পেল শূন্যের রহস্যময় শক্তিও।

১৮৮৭ সালে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারটা করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইনরিচ হার্ৎস। তিনি দেখলেন, অতিবেগুনি আলোর একটি রশ্মি প্লেটে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে পারে। ধাতব প্লেটে আলো পড়লে সেখান থেকে সহজেই ইলেকট্রন সহজেই ছিটকে বেরিয়ে আসে। আলোকরশ্মি দিয়ে স্ফুলিঙ্গ তৈরির এ ব্যাপারটা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানীদের ধাঁধাঁয় ফেলে দিয়েছিল। অতিবেগুনি আলোয় থাকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি। ফলে বিজ্ঞানীরা স্বভাবিকভাবেই ধরে নিলেন, পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে বেশ ভালো পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। তবে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে, উচ্চশক্তির আলো তৈরির আরেকটা উপায় আছে। আলোকে করতে হবে উজ্জ্বল। এই যেমন অনেক উজ্জ্বল নীল রংয়ের আলো। এর শক্তিও অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোর শক্তির সমান হতে পারে। অতএব, একটি উজ্জ্বল নীল আলোও ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে বের করতে পারা উচিত। ঠিক যেমন পারে অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলো।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা জানতে সময় লাগেনি। (উচ্চ কম্পাঙ্কের) অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোও ধাতব প্লেট থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে পারে। কিন্তু কম্পাঙ্ক কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তি মানের নিচে আনলে—আলোকে কিছুটা বেশিই লালের দিকে নিয়ে আসলে—হঠাৎ করে স্ফুলিঙ্গ তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। আলো যতই উজ্জ্বল হোক, আলোর রং সঠিক না হলে ইলেকট্রনর আটকেই থাকে। কেউ বের হয় না। আলোর তরঙ্গ এমন কাজ করার কথা নয়।

আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার এ ধাঁধাঁর সমাধান করলেন আইনস্টাইন। তবে তাঁর সমাধান প্ল্যাঙ্কের অনুকল্পের চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক ছিল। প্ল্যাঙ্ক প্রস্তাব করেছিলেন, অণুর কম্পন কোয়ান্টায়িত। আইনস্টাইন বললেন, আলো নির্গত হয় ফোটন নামের ছোট ছোট প্যাকেট অব গুচ্ছ আকারে। এ ধারণা আলোর স্বীকৃত ধর্মের বিপরীত। কারণ আইনস্টাইনের কথা মানলে মানতে হয়, আলোর তরঙ্গ নয়।

কিন্তু অন্যদিকে আলোকশক্তিকে ক্ষুদ্র প্যাকেটের গুচ্ছ ধরে নিলে আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সহজ হয়ে যায়। আলো ছোট্ট বুলেটের মতো। আঘাত হানে ধাতুতে। বুলেট গিয়ে ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়। বুলেটের যথেষ্ট শক্তি থাকলে—কম্পাঙ্ক যথেষ্ট বড় হলে—এটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে আনে। অন্যদিকে আলোককণার শক্তি যথেষ্ট না হলে এর ধাক্কায় ইলেকট্রন মুক্ত হয় না। আলোককনা বরং ধাক্কা খেয়ে সরে যায়।

আইনস্টাইনের এ চিন্তার মাধ্যমে আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দারুণ ব্যাখ্যা মিলল। আলো ফোটন কণায় কোয়ান্টায়িত। যা তরঙ্গতত্ত্বের সরাসরি বিরোধী। অথচ আগের এক শ বছরের বেশি সময় ধরে তত্ত্বটার রাজত্ব। আসলে দেখা যাচ্ছে, আলোর কণা ও তরঙ্গ দুই রকম ধর্মই আছে। আলো কখনও কণার মতো আচরণ করলেও অন্যসময় আবার তরঙ্গের মতো আচরণ করে। সত্যি আলো না কণা, না তরঙ্গ। দুইয়ের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এ ধারণাটা বোঝা সহজ কাজ নয়। তবে কোয়ান্টাম তত্ত্বের একদম কেন্দ্রীয় অংশই এটা।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে, আলো, ইলেকট্রন, প্রোটন, কুকুর—সবারই কণা ও তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু বস্তু একইসাথে কণা ও তরঙ্গ হলে আসলে সেটি কী জিনিস? গণিতবিদরা এদের সমীকরণ জানেন। এদের নাম তরঙ্গ ফাংশন। শ্রোডিংগার সমীকরণের অন্তরক সমাধান। তবে দূর্ভাগ্যের কথা হলো, এ গাণিতিক বর্ণনার কোনো সহজাত ব্যখ্যা নেই। এ তরঙ্গ ফাংশনগুলোকে বাস্তবে দেখা অসম্ভব৩। এর চেয়ে খারাপ কথা হলো, পদার্থবিদরা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার ভেতরে যেতে যেতে অদ্ভুত থেকে অদ্ভুততর জিনিসের দেখা পেতে লাগলেন। তবে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় শূন্যই সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারের জন্ম দিয়েছে। ব্যাপারটার নাম জিরো-পয়েন্ট এনার্জি।

অদ্ভুত এ বল কোয়ান্টাম বিশ্বের গাণিতিক সমীকরণের মধ্যেই গেঁথে আছে। ১৯২০-এর দশকে জার্মান পদার্থবিদ ভার্না হাইজেনবার্ক দেখেন, এ সমীকরণগুলো অবাক করা এক ফল দেয়। এগুলোয় মিশে আছে অনিশ্চয়তা। শূন্যের শক্তির জন্ম দেয় হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি।বিজ্ঞানীদের কণার বৈশিষ্ট্য জানার সক্ষমতা অনিশ্চয়তা নীতির। যেমন ধরুন, আমরা একটি নির্দিষ্ট কণা সম্পর্কে জানতে হলে এর অবস্থান ও বেগ জানা প্রয়োজন। জানতে হবে কণাটা কোথায় আছে। এর বেগ কত। হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি বলে, এ সোজা কাজটাও আমরা করতে পারব না। আমরা শতচেষ্টা করেও একইসাথে একটি কণার বেগ ও অবস্থান শতভাগ নির্ভুলভাবে জানতে পারব না। কারণ পরিমাপ করার চেষ্টাই আমাদের কাঙ্খিত তথ্যকে নষ্ট করে দেয়। কোনোকিছু মাপতে গেলে একে স্পর্শ করতে হয়। ধরুন, আপনি একটি পেন্সিলের দৈর্ঘ্য মাপছেন। পেন্সিল বরাবর আঙ্গুলটা রেখে এর দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে। তবে সেটা করতে গিয়ে পেন্সিলে একটু ধাক্কা লাগতে পারে। ফলে পেন্সিলের বেগ হালকা বদলে যাবে। আরেকটু ভাল কৌশল হবে পেন্সিলের পাশে আলতো করে একটি রুলার রাখা। তবে আসলে কিন্তু দুটি বস্তুর দৈর্ঘ্য তুলনা করতে গেলেই পেন্সিলের বেগ কিছুটা পাল্টে যাবে। আপনি পেন্সিলকে দেখবেন এটা থেকে আসা আলো দেখে। পেন্সিল থেকে আসা আলোও পেন্সিলকে উত্তেজিত করে। এ উত্তেজনা খুব মৃদু হলেও তা পেন্সিলকে খানিকটা সরিয়ে দেয়। কিঞ্চিত পাল্টে যায় পেন্সিলের বেগ। যে উপায়েই আপনি পেন্সিলের বেগ মাপুন না কেন, এতে হালকা ধাক্কা লাগবেই। হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি বলে, পেন্সিল বা ইলেকট্রনের দৈর্ঘ্য ও বেগ একইসাথে শতভাগ নির্ভুল করে জানার কোনো উপায় নেই। অবস্থান যত ভাল জানবেন, বেগ সম্পর্কে তত কম জানবেন। আবার বেগ ভালভাবে জানলে, অবস্থানের তথ্যে লেগে যাবে গড়বড়। একটি ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ভুলভাবে (শূন্য ভুল) জানলে জানা যাবে এটি নির্দিষ্ট একটি সময়ে ঠিক কোথায় আছে। সেক্ষেত্রে এটি কী বেগে চলছে সে সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানা যাবে না (শূন্য তথ্য)। আর এর বেগ অসীম নির্ভুলভাবে জানলে (শূন্য ভুল) এর অবস্থানের পরিমাপে হবে অসীম ভুল। এটা ঠিক কোথায় আছে তা একটুও জানা যাবে না৪, ৫। আপনি কখনোই দুটো একসঙ্গে জানতে পারবেন না। একটা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানলেই আরেকটি অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এটা রেকটি অলঙ্ঘনীয় সূত্র।

হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি যে শুধু মানুষের পরিমাপেই বাগড়া দেয় তা নয়। তাপগতিবিদ্যার সূত্রের মতোই এ সূত্রটাও প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করে। অনিশ্চয়তার কারণে মহাবিশ্ব শক্তিতে ভরপুর থাকে। স্থানের খুব ক্ষুদ্র একটি স্থানের কথা কল্পনা করুন। ধরুন, অনেক অনেক ছোট একটি বক্স। বক্সের মধ্যে কী চলছে সেটা নিয়ে কাজ করলে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। যেমন আমরা অনেকটা নির্ভুলভাবে কণাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে জানি। আর যাই হোক, এরা তো বক্সের ভেতরেই আছে। আমরা জানি, এরা নির্দিষ্ট একটি আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ আছে। এরা বাইরে থাকলে তো আর আমরা এদের দিকে তাকাতাম না। এর অর্থ দাঁড়াল, আমরা কণাগুলোর অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানি। তাই হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, কণাগুলোর বেগ ও শক্তি সম্পর্কে আমরা অনিশ্চিত হয়ে যাব। বক্সকে আরও ছোট করতে থাকলে আমরা কণার শক্তি সম্পর্কে জানব আরও আরও কম।

এই যুক্তি মহাবিশ্বের সর্বত্রই সত্য। চাই তা পৃথিবীর কেন্দ্রে, কিংবা স্থানের গভীরতম ভ্যাকুয়ামে। এর অর্থ দাঁড়ায়, যথেষ্ট ক্ষুদ্র স্থানের, এমনকি ভ্যাকুয়ামেরও শক্তি সম্পর্কে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু ভ্যাকুয়ামের শক্তির অনিশ্চয়তার ব্যাপারটা হাস্যকর শোনায়। সংজ্ঞা অনুসারেই ভ্যাকুয়ামে কিছু নেই। নেই কোনো কণা, আলো বা অন্য কিছু। অতএব, ভ্যাকুয়ামের তো কোনো শক্তিই থাকার কথা নয়। এরপরেও হাইজেনবার্কের অনিশ্চয়তা নীতি বলছে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভ্যাকুয়ামের একটি আয়তনে কতটুকু শক্তি আছে তা আমরা বলতে পারব না। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি ভ্যাকুয়ামের শক্তিও প্রতি মুহূর্তে ওঠানামা (fluctuation) করতে থাকবে।

ভ্যাকুয়ামে নেই কোনোকিছু। সেখানে আবার শক্তি থাকতে পারে কীভাবে? উত্তরটা আসে আরেকটি সমীকরণ থেকে। আইনস্টানের বিখ্যাত ভর-শক্তি সমীকরণ: E = mc2। সরল এ সূত্র ভর ও শক্তিকে জোড়া দেয়। বস্তুর ভর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির সমতুল্য। (কণাপদার্থবিদরা ইলেকট্রনের মতো কণার ভর পাউন্ড বা কেজিতে মাপেন না। ভর বা ওজনের প্রচলিত অন্য কোনো এককও ব্যবহার করেন না। তাঁরা বলেন, ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর হলো ০.৫১১ মেগাইলেকট্রন ভোল্ট—MeV)। ভ্যাকুয়ামের শক্তির ওঠানামা আর ভরের ওঠানামা একই কথা। কণারা প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্ব পাচ্ছে ও হারাচ্ছে৬। লুই ক্যারোলের অ্যালিস ইন দ্য ওয়ান্ডারল্যান্ড উপন্যাসের চেশায়ার বিড়ালের মতো। ভ্যাকুয়াম কখনোই সত্যিকারের শূন্য নয়। বরং ভার্চুয়াল কণায় ভর্তি। স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে অসীম কণা প্রতি মুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। এটাই জিরো-পয়েন্ট এনার্জি বা শূন্য-বিন্দুর শক্তি। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসীম। সুস্পষ্ট করে বললে শূন্য-বিন্দুর শক্তির পরিমাণ সীমাহীন। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সমীকরণ অনুসারে, কয়লা খনি, তেলক্ষেত্র বা নিউক্লীয় অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তি আছে একটি কাঠির ভেতরে।

সাধারণত সমীকরণে অসীম থাকলে পদার্থবিদরা ধরে নেন, কোথাও ভুল হয়েছে। অসীমের নেই কোনো ভৌত বা বাস্তব অর্থ। শূন্য-বিন্দুর শক্তিও ব্যতিক্রম নয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী একে পুরোপুরি উপেক্ষা করেন। তারা ধরেই নেন, শূন্য-বিন্দুর শক্তির মান শূন্য। যদিও তাঁরা জানেন এটা আসলে অসীম। এটা একটি সুবিধাজনক কল্পনা। সাধারণত এর কোনো গুরুত্বই নেই। তবে কখনও আবার আছে। ১৯৪৮ সালে দুজন ডাচ পদার্থবিদ সেটা বুঝতে পারেন। হেনড্রিক কাজিমির ও ডার্ক পোল্ডার বুঝতে পারেন, শূন্য-বিন্দুর শক্তিকে সবসময় উপেক্ষা করা যাবে না। তাঁরা পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল নিয়ে কাজ করছিলেন। দেখলেন, পরিমাপকৃত বল মিলছে না সূত্রের অনুমানের সাথে। ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে কাজিমির টের পান, তিনি শূন্যের শক্তি অনুভব করেছেন।

কাজিমির বলের রহস্য তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত। প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরাস তার টেনে উপরে-নিচে ওঠানামা করা তরঙ্গের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক জেনেছিলেন। দেখেছিলেন, কিছু সুর ওঠে, কিছু আবার নিষিদ্ধ। একটি তারকে বাজালে পরিষ্কার সুর শোনা যায়। এর নাম মৌলিক সুর। আঙ্গুলকে আলতো করে তারের মাঝে রাখলে টান দিলে আরেকটি সুন্দর ও পরিষ্কার সুর শোনা যাচ্ছে। এবারের সুরটা মৌলিক সুরের ওপরে অষ্টক। একতৃতীয়াংশ নিচে আছে আরেকটি সুন্দর সুর। কিন্তু পিথাগোরাস বুঝতে পারেন, সবখানে সুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। তারের মধ্যে ইচ্ছামতো কোথাও আঙ্গুল রাখলে খুব কমই পরিষ্কার সুর পাওয়া যায়। তারে শুধু নির্দিষ্ট কিছু সুরই সম্ভব। বেশিরভাগ জায়গায়ই সুর নেই (চিত্র ৪৮)।

বেশিরভাগ তরঙ্গই তারের তরঙ্গের মতো করেই কাজ করে। নির্দিষ্ট আকারের গিটারের তার সম্ভাব্য সব রকম সুর তুলতে পারে না। কিছু কিছু তরঙ্গ "নিষিদ্ধ"। একইভাবে কণার কিছু তরঙ্গের জন্য বক্সের ভেতরে থাকা নিষিদ্ধ। এই যেমন, দুটি ধাতব প্লেটকে কাছাকাছি রাখলে সব ধরনের কণাকে এদের মাঝখানে জায়গা দেওয়া যাবে না। বক্সের আকারের সাথে তরঙ্গের আকার মিলে গেলেই শুধু সে তরঙ্গ বক্সের ভেতরে থাকার সুযোগ পাবে (চিত্র ৪৯)।

চিত্র ৪৮: গিটারের তারে নিষিদ্ধ সুর।

কাজিমির বুঝতে পারেন, নিষিদ্ধ কণাতরঙ্গ ভ্যাকুয়ামের শূন্য-বিন্দুর শক্তিকে প্রভাবিত করবে। কারণ কণারা সর্বত্র আবির্ভুত ও উধাও হচ্ছে। দুটি ধাতব প্লেটকে কাছাকাছি রাখলে কিছু কণা দুই প্লেটের মাঝখানে থাকার অনুমতি পাবে না। ফলে প্লেটের ভেতরের চেয়ে বাইরে কণার সংখ্যা বেশি। প্লেটের বাইরের কণার ঝাঁক প্লেটকে বাইরে থেকে ধাক্কা দেবে। ভেতরে থেকে সে ধাক্কার জবাব দেওয়ার মতো কণার অভাব থাকায় প্লেট দুটো একে অপরের দিকে ধাবিত হবে। কাজটা ঘটবে গভীরতম ভ্যাকুয়ামেও। এটাই ভ্যাকুয়ামের শক্তি। যে শক্তির উৎস শূন্যতা। এটাই কাজিমির প্রভাব।

চিত্র ৪৯: কাজিমির প্রভাব

কাজিমির প্রভাবের কথা শুনতে কল্পকাহিনী মনে হয়। কিন্তু শূন্যতা থেকে সৃষ্ট এ রহস্যময়র ভূতুড়ে বলের অস্তিত্ব বাস্তব। এ বলের পরিমাণ খুব ক্ষুদ্র। পরিমাপ করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু ১৯৯৫ সালে স্টিভেন ল্যামোর সরাসরি এটা পরিমাপ করেন। তিনি স্বর্ণ দিয়ে আবৃত দুটি প্লেটকে সংবেদনশীল মোচড়-পরিমাপকের মধ্যে স্থাপন করেন। পরিমাপ করে দেখেন, কাজিমির বলকে প্রতিহত করতে কতটুকু বল প্রয়োজন হয়। প্রাপ্ত উত্তর মিলে যায় কাজিমির তত্ত্বের সাথে। একটি পিপড়াকে ত্রিশ হাজার ভাগ করলে এর যতটা ওজন হবে তার প্রায় সমান এ বল। ল্যামোর শূন্যস্থানের তৈরি বল পরিমাপ করলেন।

আপেক্ষিকীয় শূন্য: ব্ল্যাকহোল

[নক্ষত্রটা] চেশায়ার বিড়ালের মতো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। একটি পেছনে রেখে গেল এর দেঁতো হাসি। আরেকটি রেখে গেল শুধু মহাকর্ষীয় আকর্ষণ।—জন হুইলার

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যায় শূন্য ভ্যাকুয়ামে অসীম শক্তি সরবরাহ করে। আরেক আধুনিক তত্ত্ব আপেক্ষিকতায় শূন্য অন্য একটি প্যারাডক্সের জন্ম দেয়। ব্ল্যাকহোলের অসীম শূন্যতা। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার মতোই আপেক্ষিকতার জন্ম আলোর মধ্যে। এক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে আলোর গতি। মহাবিশ্বের বেশিরভাগ বস্তুর গতি সম্পর্কেই সব পর্যবেক্ষক একমত হবেন না। ধরুন, একটি ছেলে বিভিন্ন দিকে পাথর ছুঁড়ছে। ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসা পর্যবেক্ষকের কাছে দূরে সরা পর্যবেক্ষকের চেয়ে পাথরে গতি বেশি মনে হবে। পাথরের বেগ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের গতি ও দিকের ওপর। একইভাবে আলোর বেগও পর্যবেক্ষকের বেগের সাথে সাথে বদলে যাওয়া উচিত। ১৮৮৭ সালে মার্কিন পদার্থবিদ অ্যালবার্ট মাইকেলসন ও এডওয়ার্ড মর্লি এ প্রভাব পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। আলোর বেগে কোনো পার্থক্য না পেয়ে তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে যান। সকল দিকেই আলোর গতি একই। এটা কীভাবে সম্ভব?

১৯০৫ সালে আবারও সেই তরুণ আইনস্টাইন উত্তরটা দিলেন। আবারও দেখা গেল, সরল কিছু অনুমান বড় ফলাফল প্রদান করে। আইনস্টাইনের প্রথম অনুমানটা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যায়। আইনস্টাইন বললেন, কিছুসংখ্যক মানুষ একটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে সে ঘটনায় পদার্থবিদ্যার সূত্র সবার জন্য একই হবে। যেমন ধরুন, একটু কাক মাটি থেকে উড়ে গাছে চলে গেল। আপনি এ ঘটনা সম্পর্কে দুজন মানুষের বর্ণনা নিলেন। একজন মানুষ আছেন ভূমিতে। আরেকজন চলন্ত ট্রেনে। দুজনের জন্য পদার্থবিদ্যার সূত্র একই হবে। তবে তারা কাকের ও গাছের গতি সম্পর্কে ভিন্ন মত দেবে। যদিও কাকের উড্ডয়নের শেষ পরিণতি দুজনের কাছে একই। কয়েক সেকেন্ড পরে কাক পৌঁছে যাবে গাছে। শেষ ফলের ব্যাপারে দুই পর্যবেক্ষক একমত। যদিও কিছু ব্যাপারে দুজনের মতের পার্থক্য থাকবে। এটাই আপেক্ষিকতার নীতি। (আপাতত আমরা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছি। এ তত্ত্বে গতির ধরনে কিছু বিধিনিষেধ আছে। প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে সরল রেখায় নির্ধিষ্ট বেগে চলতে হবে। অন্য কথায়, তাদের বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া চলবে না। আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বে এ বিধিনিষেধ দূর করা হয়।)

দ্বিতীয় অনুমানটকে আরেকটু বেশি গোলমেলে মনে হয়। তার ওপর দেখে মনে এটি আপেক্ষিকতার নিয়মেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আইনস্টাইন বললেন, বেগ যাই হোক না কেন, ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানে আলোর বেগের ব্যাপারে সবাই একমত হবে। এ বেগের মান সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। ধ্রুব এ মানকে c দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কেউ আপনার দিকে আলো ফেললে সে আলো আপনার দিকে ছুটে আসবে c বেগে। আলো ফেলা মানুষটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে, নাকি আপনার দিকে বা বিপরীত দিকে ছুটছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক। আলোকরশ্মি সবসময় আপনার বা যেকারো দৃষ্টিতে c বেগে চলে।

বস্তুর গতি সম্পর্কে পদার্থবিদদের জানা সবকিছুকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল এ অনুমান। কাক আলোর মতো আচরণ করলে ট্রেনে ও বাইরে দাঁড়ানো দর্শক কাকের গতি সম্পর্কে একমত হতে হবে। এর অর্থ হবে, কাকের গাছে পৌঁছানোর সময় সম্পর্কে দুই পর্যবেক্ষক ভিন্ন কথা বলবেন (চিত্র ৫০)। আইনস্টাইন বুঝলেন, এ সমস্যা দূর করার একটি উপায় আছে। ধরে নিত হবে, পর্যবেক্ষকের গতির ওপর নির্ভর করে সময়ের প্রবাহ পাল্টে যায়। স্থির ঘড়ির তুলনায় ট্রেনের ঘড়ির ধীরে চলবে। ভূমিতে অতিবাহিত দশ সেকেন্ড ট্রেনে থাকা কারও কাছে মাত্র পাঁচ মিনিট মনে হতে পারে। দ্রুত বেগে ছুটে চলা কারও কাছেই একই ব্যাপার মনে হবে। তার হাতে থাকা স্টপওয়াচের প্রতিটি টিক স্থির পর্যবেক্ষকের কাছে এক সেকেন্ডের বেশি সময় পরে হবে বলে মনে হবে। ধরুন, একজন মহকাশচারী আলোর বেগের ৯০ ভাগ বেগে ২০ বছর (তার নিজের ঘড়ি অনুসারে) ভ্রমণ করে এলেন। ২০ বছর বয়স বাড়িয়ে তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এটাই তো হওয়ার কথা। কিন্তু পৃথিবীতে থাকা বাকি সবার বয়স বাড়বে ৪৬ বছর।

চিত্র ৫০: কাকের গতিবেগ ধ্রুব থাকার অর্থ, সময় অবশ্যই আপেক্ষিক হবে।

গতির সাথে সাথে শুধু সময়ই বদলায় না, বদলে যায় দৈর্ঘ্য এবং ভরও। গতি বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর দৈর্ঘ্য কমে এবং ভর বাড়ে। আলোর ৯০ ভাগ গতিতে স্থির দর্শকের কাছে এক গজের কাঠির দৈর্ঘ্য হবে মাত্র ০.৪৪ গজ। এক কেজি ভরের এক ব্যাগ চিনি হবে ২.৩ কেজি। (তবে এর মানে এ নয়, আপনি একই ব্যাগ দিয়ে বেশি বিস্কুট বানাতে পারবেন। ব্যাগের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিমাণ ও ভর একই থাকবে।)

সময়প্রবাহের এ পরিবর্তন অবিশ্বাস্য লাগতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষনে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। অতিপারমাণবিক কণারা দ্রুত চললে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার আগে এটি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় টিকে থাকে। কারণ এর সময় ধীরে চলে। দ্রুতবেগে চলা বিমানের মধ্যে সূক্ষ্ম ঘড়িকে ধীরে চলতে বাস্তবে দেখা গেছে৭। আইনস্টাইনের তত্ত্ব কাজ করে। কিন্তু তাও একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সেটা আর কিছুই নয়, শূন্য।

যানের বেগ আলোর বেগের কাছাকাছি হলে সময় অনেক অনেক বেশি ধীর হয়ে যায়। যান আলোর বেগে চললে যানের ভেতরের ঘড়ির একটি টিক হতে হতে বাইরে অসীম সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। এক সেকেন্ডেরও অনেক ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে লক্ষ-কোটি বছর পার হয়ে যাবে। ততদিনে মহাবিশ্ব এর অন্তিম ভাগ্য বরণ করে ফেলবে। হয়ে যাবে ধ্বংস। যানের ভেতরের মহাকাশচারীর জন্য সময় থেমে যাবে। সময়ের প্রবাহ গুন হবে শূন্য দিয়ে।

তবে সময়কে থামিয়ে অত সহজ কথা নয়। যানের বেগ বাড়াতে থাকলে সময় ক্রমেই ধীর হতে থাকে। তবে একইসাথে যানের ভর বাড়তেই থাকে। ব্যাপারটা যেন এমন: আপনি একটি বেবি ক্যারিয়েজকে ঠেলছেন। আর বাচ্চাটা ক্রমেই বড় হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর তো আপনি যাকে ঠেলছেন, সে কোনো বাচ্চা নয়, এক সুমো কুস্তিবিদি। এখন আর তাকে ঠেলে নেওয়া সহজ নয়। এরপরেও তার বেগ বাড়ানো গেলে বাচ্চার ভর বেড়ে হবে গাড়ির সমান। তারপর জাহাজ ও তারপর পুরো এক গ্রহের সমান। আর তারপর...নক্ষত্র, ছায়াপথ। বাচ্চার ভর বড় হওয়ার সাথে সাথে ঠেলার প্রভাব কমতে থাকবে। একইভাবে মহাকাশযানেরও বেগ বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্রমেই আলোর বেগের কাছাকাছি নিতে পারবেন। কিন্তু এক সময় এর ভর হবে বিশাল। ফলে আর বেগ বাড়ানো সম্ভবই হবে না। মহাকাশযান বা ভরবিশিষ্ট যেকোনো বস্তুই আসলে কখনও আলোর বেগকে ধরতে পারবে না। আলোর বেগ হলো বেগের চূড়ান্ত সীমা। আপনি কখনোই এর সমান বেগ অর্জন করতে পারবেন না। একে ছাড়িয়ে যাওয়া তো আরও পরের কথা। প্রকৃতি নিজেকে দুষ্ট শূন্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

তবে প্রকৃতি কি আসলেই শূন্যের সাথে পেরে ওঠেছে? আইনস্টাইন নিজেই আপেক্ষিকতাকে বর্ধিত করে মহাকর্ষকে যুক্ত করেন৮। তিনি ভুলেও ভাবেননি, আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের এ নতুন সমীকরণগুলো চূড়ান্ত শূন্যকে ডেকে নিয়ে আসবে। আরও আনবে সবচেয়ে খারাপ অসীমকে। বলছি ব্ল্যাকহোলের কথা।

আইনস্টাইনের সমীকরণ স্থান ও কালকে একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন দিক হিসেবে দেখে। এমনিতেই আমরা জানি, বেগ বাড়ালে (ত্বরণ অর্জন করলে) স্থান মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ধরনে পরিবর্তন আসে। বেগ বাড়তে বা কমতে পারে। আইনস্টাইনের সমীকরণ দেখাল, ত্বরণ স্থানের পাশাপাশি সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন আসে। ত্বরণের কারণে সময় দ্রুত বা ধীরে প্রবাহিত হতে পারে। ফলে কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগ করে ত্বরণ দিলে (সেটা হোক মহাকর্ষ কিংবা অন্য কোনো ত্বরণ বা পরিবর্তনশীল বেগ) স্থান ও সময়ের মধ্যে এর গতি বদলে যাবে। মানে বদলে যাবে স্থান-কাল।

ধারণাটা বোঝা সহজ নয়। তবে স্থান-কাল বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো একটি উপমা। স্থান-কাল বিশাল এক খণ্ড রাবারের চাদরের সাথে তুলনীয়। গ্রহ, নক্ষত্র ও বাকি সবকিছু সে চাদরে অবস্থিত। ফলে চাদর একটু বিকৃত হয়। চাদরে অবস্থিত বস্তুর সৃষ্ট বিকৃতি বা বক্রতাই মহাকর্ষ। চাদরে যত ভারী বস্তু থাকবে, চাদরের বিকৃতিও তত বেশি হবে। বস্তুটার চারপাশেও তত বড় টোল তৈরি হবে।

রাবারের চাদরের বক্রতা শুধু স্থানের নয়, সময়েরও বক্রতা। ভারী বস্তু শুধু স্থানকে বাঁকায় না, সময়কেও বাঁকায়। বক্রতা বাড়ার সাথে সাথে বক্রতা বড় থেকে আরও বড় হতেই থাকে। ভরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। স্থানের বেশি বাঁকানো অঞ্চলে প্রবেশ করলে ভরও বাস্তবিক অর্থেই বেড়ে যায়। এ ঘটনার নাম ভর স্ফীতি (mass inflation)।

এ উপমার মাধ্যমে গ্রহের কক্ষপথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। চাদরের মধ্যে সূর্যের তৈরি টোলের মধ্যে পৃথিবী ভেসে চলছে। আলো সরলপথে চলে না। নক্ষত্রের চারপাশে চলে বাঁকা পথে। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ আর্থার এডিংটন এক অভিযানে এটা বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সূর্যগ্রহণের সময় একটি নক্ষত্রের অবস্থান পরিমাপ করেন। দেখতে পান আইনস্টাইনের পূর্বানুমিত বক্রতার নিদর্শন (চিত্র ৫১)।

আইনস্টাইনের সমীকরণ আরও ভয়ঙ্কর জিনিসেরও পূর্বাভাস দেয়। এ জিনিসের নাম ব্ল্যাকহোল। এমন এক নক্ষত্র, যার ঘনত্ব এত বেশি যে এর হাত থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। ব্যর্থ আলোও।

চিত্র ৫১: মহাকর্ষ সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়া আলোকে বাঁকিয়ে দেয়।

অন্যসব নক্ষত্রের মতোই ব্ল্যাকহোলের৯ জীবন শুরু হয় উত্তপ্ত গ্যাসের বিশাল গোলক হিসেবে। গ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে হাইড্রোজেন। স্বাধীন ছেড়ে দিলে গ্যাসের যথেষ্ট বড় একটি গোলক নিজের মহাকর্ষীয় ওজনে চুপসে যাবে। গুটিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটি খণ্ডে রূপ নেবে। আমাদের ভাগ্য ভাল, নক্ষত্র গুটিয়ে যায় না। কারণ কাজ করে আরও একটি বল। নিউক্লীয় ফিউশন। গ্যাসীয় মেঘ গুটিয়ে যেতে থাকলে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুরা একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় দ্রুত থেকে দ্রুততর বলে। একসময় নক্ষত্র এত বেশি উত্তপ্ত ও ঘন হয় যে হাইড্রোজেন পরমাণুরা একে অপরের সাথে মিশে যায়। তৈরি হয় হিলিয়াম। এ সময় নির্গত হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি। এ শক্তির উৎস নক্ষত্রের কেন্দ্র। এর ফলে নক্ষত্র আবার কিছুটা প্রসারিত হয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় নক্ষত্র এ অস্থির সাম্যবস্থায় (equilibrium) থাকে। মহাকর্ষের মাধ্যমে তৈরি গুটিয়ে যাওয়ার প্রবণতার বিপরীতে কাজ করে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন ফিউশন থেকে সৃষ্ট শক্তি।

এ সাম্যাবস্থা চিরকাল থাকে না। নিজেকে জ্বালানোর জন্য নক্ষত্রের কাছে থাকা হাইড্রোজেনের পরিমাণ সীমিত। কিছু সময় পরে ফিউশন প্রক্রিয়া থেমে আসে। নষ্ট হয় সাম্যাবস্থা। (এ প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে নক্ষত্রের আকারের ওপর। নির্মম পরিহাস! বড় নক্ষত্রে বেশি হাইড্রোজেন থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে জীবনকাল হয় ছোট। কারণ এ নক্ষত্র জ্বলেও দ্রুত। সূর্যের হাতে আরও ৫০০ কোটি বছর জ্বলার মতো জ্বালানি আছে। তবে এত দীর্ঘ সময় দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই। তার আগেই সূর্যের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। যাতে উড়ে যাবে সমুদ্রের পানি। পৃথিবী হয়ে যাবে শুক্র গ্রহের মতো বাসের অযোগ্য এক মরুভূমি। পৃথিবীতে আরও ১০০ কোটি বছর প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকলেই আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান ভাবতে পারি।) একের পর এক মরণযন্ত্রনা শেষে চূড়ান্ত পরিণতি আবারও নির্ভর করবে ভরের ওপর। নক্ষত্রের ফিউশন যন্ত্র বন্ধ হবে। মহাকর্ষের চাপে নক্ষত্র আবারও চুপসাতে থাকবে।

তবে নক্ষত্রকে চুপসে গিয়ে বিন্দুর সমান হয়ে যাওয়া ঠেকায় কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার একটি সূত্র। নাম পাউলির বর্জন নীতি। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝিতে জার্মান পদার্থবিদ ভলফগ্যাং পাউলি সূত্রটা আবিষ্কার করেন। নীতিটার বক্তব্য অনেকটা এরকম: দুটি জিনিস একইসাথে একই জায়গায় থাকতে পারে না। বিশেষ করে, একই কোয়ান্টাম অবস্থার দুটি ইলেকট্রনকে জোর করেও একই জায়গায় রাখা যাবে না। ১৯৩৩ সালে ভারতীয় পদার্থবিদ সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর বুঝতে পারেন, মহাকর্ষের চাপের বিপরীতে পাউলির বর্জন নীতির ক্ষমতাও তুচ্ছ।

নক্ষত্রের ভেতরে চাপ বাড়তে থাকলে পাউলির বর্জন নীতি বলে, ইলেকট্রনরা একে অপরকে এড়ানোর জন্য দ্রুত থেকে দ্রুততর চলাচল করতে থাকে। কিন্তু চলাচলের গতির তো একটি সীমা আছে। ইলেকট্রন আলোর চেয়ে বেশি জোরে চলতে পারে না। ফলে একটি বস্তুখণ্ডে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করা হলে একে চুপসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হলে ইলেকট্রনদের যত জোরে ছোটা দরকার তারা সেটা পারে না। চন্দ্রশেখর দেখান, চুপসে যেতে থাকা নক্ষত্রের ভর সূর্যের ১.৪ গুন হলে মহাকর্ষ পাউলির বর্জন নীতিকে পরাজিত করবে। চন্দ্রশেখর সীমার ওপরে মহাকর্ষ হবে ভয়ানক শক্তিশালী। ইলেকট্রনের কিছুই করার থাকবে না। হাল ছেড়ে চিরতরে। ইলেকট্রন গিয়ে ধাক্কা খাবে পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটনের সাথে। তৈরি হবে নিউট্রন। ভারী নক্ষত্রটা শেষ পর্যন্ত নিউট্রন দিয়ে গড়া এক দৈত্যাকার গোলকে পরিণত হবে। এরই নাম নিউট্রন নক্ষত্র।

হিসাব এখানেই থেমে থাকেনি। দেখা যায়, গুটাতে থাকা নক্ষত্রের ভর চন্দ্রশেখর সীমার কিছুটা বেশি হলে ইলেকট্রনদের মতোই নিউট্রনদের চাপ নক্ষত্রকে আরও বেশি গুটিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। নিউট্রন নক্ষত্রে এটাই ঘটে। এ সময় নিউট্রন নক্ষত্রের ঘনত্ব এত বেশি হয় যে এক চামচ পরিমাণ পদার্থের ভর হয় কয়েক কোটি টন। তবে নিউট্রন নক্ষত্রেরও চাপ সামলানোর একটি সীমা আছে। কোনো কোনো জ্যোতির্পদার্থবিদ বিশ্বাস করেন, আরেকটু বেশি চাপে নিউট্রন আলাদা হয়ে এর উপদান কোয়ার্ক তৈরি হয়। তৈরি হয় কোয়ার্ক নক্ষত্র। কিন্তু এটাই প্রতিরোধের শেষ বিন্দু। এরপর ঘটে যায় নরক গুলজার।

মাত্রাতিরিক্ত ভারী নক্ষত্র চুপসে গিয়ে উধাও হয়ে যায়। মহাকর্ষীয় বল হয়ে যায় চরম। পদার্থবিদর মহাবিশ্বে এমন কোনো বলের কথা জানেন না, যা কিনা নক্ষত্রের সঙ্কোচন ঠেকাতে পারে। ইলেকট্রনের বিকর্ষণ বা নিউট্রন বা কোয়ার্কদের একে অপরের দিকে চাপ কোনো কিছুই কাজটা করতে পারবে না। মুমূর্ষু নক্ষত্র ছোট থেকে আরও ছোট হতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত ... শূন্য। নক্ষত্রটা নিজেকে ঠেসে ঠেসে শূন্য আয়তনের জায়গায় বসিয়ে দেয়। এটাই ব্ল্যাকহোল। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর তো বিশ্বাস, ব্ল্যাকহোল কাজে আগিয়ে আলোর চেয়ে বেহসি গতিতে চলাচল করা যাবে। যাওয়া যাবে অতীতের দিকে।

ব্ল্যাকহোলের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণ এর স্থান-কালের বক্রতার ধরন। ব্ল্যাকহোল একেবারেই কোনো স্থান দখল করে না। কিন্তু এর ভর আছে। ভর থাকায় এটি স্থান-কালকে বাঁকায়। এমনিতে এতে কোনো সমস্যা নেই। ভারী নক্ষত্রের কাছে গেলে বক্রতা বাড়তে থাকবে। কিন্তু নক্ষত্রের বাইরের প্রান্ত অতিক্রম করলে বক্রতা আবার কমবে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে বক্রতা হবে সবচেয়ে কম। বিপরীতভাবে ব্ল্যাকহোল হলো একটি বিন্দুমাত্র। এটি দখল করে শূন্য পরিমাণ জায়গা। নেই কোনো বহিঃস্থ প্রান্ত। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে বক্রতা আবার কমতে থাকবে। ব্ল্যাকহোলের কাছে যেতে থাকলে স্থানের বক্রতা কেবলই বাড়তে থাকে। কখনোই কমে না। ব্ল্যাকহোলের কোনো জায়গা নেই বলে বক্রতা হয় অসীম। স্থান-কালের মধ্যে নক্ষত্রটি একটি ছিদ্র তৈরি করে ৯চিত্র (চিত্র ৫২)। ব্ল্যাকহোলের শূন্য একটি সিংগুলারিটি। মহাবিশ্বের কাঠামোয় এক উন্মুক্ত ক্ষত।

ধারণাটা খুব অসুবিধাজনক। স্থান-কালের মসৃণ ও অবিচ্ছিন্ন কাঠামোয় আছে ক্ষত। আর কেউ জানে না এসব ক্ষতের অঞ্চলে ঠিক কী ঘটে। আইনস্টাইন নিজেও সিংগুলারিটির ধারণার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। অস্বীকার করেছিলেন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বই। কিন্তু তিনি ছিলেন ভুল। ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আছে। তবে ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটি খুব বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর। প্রকৃতি একে আলাদা করে রাখে। ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের শূন্যটিকে সে কাউকে দেখতে দেয় না। ওখানে একবার কেউ গেলে তাকে ফিরে আসতেও দেয় না। প্রকৃতি আছে একটি মহাজাগতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

চিত্র ৫২: ব্ল্যাকহোল অন্য নক্ষত্র থেকে আলাদা। স্থান-কালের মধ্যে তৈরি করে ছিদ্র।

এ প্রতিরক্ষা প্রদান করে মহাকর্ষ নিজেই। উপরের দিকে একটি পাথর ছুঁড়লে পৃথিবীর অভিকর্ষ একে আবার টেনে মাটিতে নিয়ে আসবে। তবে যথেষ্ট জোরে ছুঁড়লে এটি আর ফেরত আসবে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে এটি মুক্ত হয়ে যাবে পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে। মঙ্গলে যান পাঠানোর সময় নাসা মোটামুটি এ কাজটাই করে। ন্যূনতম যে বেগে ছুঁড়লে কোনো বস্তু দূরে চলে যায় তার নাম মুক্তিবেগ (escape velocity)। ব্ল্যাকহোল এত ঘন যে এর কাছাকাছি গেলে মুক্তিবেগ হবে আলোর গতির চেয়ে বেশি। এ বিশেষ সীমানার নাম ঘটনা দিগন্ত (event horizon)। ঘটনা দিগন্তের ওপারে মহাকর্ষ এত শক্তিশালী, স্থান এত বক্র যে আলোসহ কোনো কিছুই এর ভেতর থেকে বের হতে পারে না।

হ্যাঁ, ব্ল্যাকহোলও একটা নক্ষত্র। তবে এর কোনো আলোই ঘটনার দিগন্তের এপারে আসতে পারে না। এজন্যই এটা ব্ল্যাক বা কালো। ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটি দেখার একমাত্র উপায় হলো ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা। সেটা করতে গেলেও অসুবিধা আছে। তীব্র মহাকর্ষ মহাকাশচারী টেনে লম্বা করে বিশাল আকারের সেমাইয়ের মতো বানিয়ে ফেলবে। তাও ধরা যাক, এমন একটা স্পেসস্যুট বানানো হলো যা দিয়ে লম্বা হওয়া ঠেকানো সম্ভব হলো। তবুও আপনার দেখা দৃশ্য কাউকে এসে বলার সুযোগ পাবেন না। ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে ওপাশে যাওয়ার পর আপানর পাঠানো কোনো সঙ্কেত এপাশে পৌঁছবে না কোনোদিন। পার হয়ে আসতে পারবেন না আপনি নিজেও। ঘটনা দিগন্ত পার হওয়া যেন মহাবিশ্বের সীমানা পার হয়ে চলে যাওয়া। ফেরত আসার আর কোনো সুযোগ নেই। মহাজাগতিক এ প্রতিরক্ষা এতটাই শক্তিশালী।

প্রকৃতি ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটিকে গোপন রাখার চেষ্টা করলেও বিজ্ঞানীরা জানেন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব বাস্তবে আছে। স্যাজিটেরিয়াস তারামণ্ডলের দিকে আছে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্র। আর ছায়াপথের ঠিক কেন্দ্রে আছে একটি অতিভারী (supermassive) ব্ল্যাকহোল। এর ভর ২০ থেকে ২৫ লক্ষ সূর্যের সমান। জ্যোতির্বিদরা কিছু কিছু নক্ষত্রকে অদৃশ্য এক সঙ্গীর সাথে নাচতে দেখেছেন। সঙ্গী তারার গতি দেখে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি বোঝা যায়। যদিও ব্ল্যাকহোল নিজে অদৃশ্য। তবে বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোল দেখলেও এখন পর্যন্ত দেখেননি কেন্দ্রের শূন্য। কারণ বিশ্রী এ সিংগুলারিটিকে গোপন করে রেখেছে ঘটনা দিগন্ত।

এটা একটা ভাল দিক। ঘটনা দিগন্ত না থাকলে সিংগুলারিটি থাকত মহাবিশ্বের দিকে উন্মুক্ত। এতে করে ঘটত অদ্ভুত সব ঘটনা। তাত্ত্বিকভাবে ঘটনা দিগন্তবিহীন একটি উন্মুক্ত সিংগুলারিটি আলোর চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করবে। চলতে দেবে অতীতের দিকে। এটা করা যাবে ওয়ার্মহোল নামে একটি জিনিসের মাধ্যমে।

রাবারের চাদরের উপমায় ফিরে আসি। সিংগুলারিটি হলও অসীম বক্রতার বিন্দু। স্থান-কালের কাঠামোয় একটি গর্ত অব ছিদ্র। কিছু কিছু নির্দিষ্ট অবস্থায় একে টেনে বিস্তৃত করা যাবে। গাণিতিকভাবে দেখা গেছে, ব্ল্যাকহোলের ঘূর্ণন বা বৈদ্যুতিক চার্জ থাকলে সিংগুলারিটি কোনো বিন্দু হবে না। হবে স্থান-কালের মধ্যে একটি রিং বা বলয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এমন দুটি প্রলম্বিত সিংগুলারিটিকে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে জোড়া যুক্ত করা যেতে পারে। এ সুড়ঙ্গের নাম ওয়ার্মহোল চিত্র ৫৩)। ওয়ার্মহোলের অভিযাত্রী স্থান ও সম্ভবত কালের অন্য বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবেন। তাত্ত্বিকভাবে ওয়ার্মহোল আপনাকে চোখের পলকে মহাবিশ্বের অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। পারে পেছন বা সামনের কোনো সময়েও পৌঁছে দিতে (দেখুন পরিশিষ্ট ঙ)। আপনি আপনার দাদীকে তরুণী অবস্থায়ও দেখে ফেলতে পারেন। দাদার সাথে তার বিয়ের আগে তাকে মেরে ফেলতে পারেন। তাদের বিয়ে হলো না। আপনার বাবা বা আপনারও আর জন্মই হলো না। জন্ম হলো বরং ভয়ানক এক প্যারাডক্সের।

হ্যাঁ, একটি প্যারাডক্সই। যার জন্ম দেয় সার্বিক আপেক্ষিকতার সমীকরণের শূন্য। ওয়ার্মহোল বাস্তবে আছে কিনা তা সত্যি করে কেউ জানে না। তবে নাসা আশা করছে ওয়ার্মহোল যেন থাকে।

চিত্র ৫৩: একটি ওয়ার্মহোল

বিনা পুঁজিতে লাভ?

ফ্রি লাঞ্চ বলতে কিছু নেই।

—তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র

নাসার আশা করছে, দূরের নক্ষত্র ভ্রমণের চাবিকাঠি হয়তো শূন্যের হাতেই আছে। ১৯৯৮ সালে নাসা একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। বিষয় ছিল *ফিজিক্স ফর দ্য থার্ড মিলেনিয়াম*। এখানে বিজ্ঞানীরা ওয়ার্মহোলের গুনাগুণ, বক্র পথে ভ্রমণ, ভ্যাকুয়াম এনার্জি দিয়ে তৈরি যন্ত্র ও অপ্রথাগত ধারণা নিয়ে বিতর্ক করেন।

মহাশূন্য ভ্রমণের অসুবিধা হলো ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই। পুলে সাঁতার কাটার সময় আমরা পানিতে ধাক্কা দেই। পানি চলে যায় পেছনে, আর আমরা সামনে। মাটিতে হাঁটার সময় পা দিয়ে ধাক্কা দেই। সে ধাক্কা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাই সামনে। মহাশূন্যে পেছন দিকে ধাক্কা দেওয়ার মতো কিছু নেই। চাইলে বৈঠা চালানো যাবে। তবে তাতে কোনো গতি আসবে না।

রকেট তাই পেছনে ধাক্কা তৈরির জন্য নিজেই সাথে রাখে জিনিস। রকেটের জ্বালানি ইঞ্জিনের মধ্যে জ্বলে পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। যানকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দেয় সামনে। ঠিক যেভাবে বেলুন থেকে নির্গত বাতাস একে কক্ষের এদিক-সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে ভ্রমণের জন্য জ্বালানি বের করে ধাক্কা দিয়ে এগোনো খুব ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য কাজ। কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে দূরের নক্ষত্রে অভিযান পাঠানো এভাবে অসম্ভব। আধুনিককালে রাসায়নিক ইঞ্জিনের উন্নতি হয়েছে। আধুনিক ইঞ্জিন বিদ্যুতের মাধ্যমে রকেট থেকে পেছন দিকে গ্যাস বের করে দেয়। তবুও এগুলো যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয়। সবচেয়ে কাছে নক্ষত্রে পৌঁছতেও রকেটের জন্য সুবিশাল পরিমাণ জ্বালানি লাগবে। জ্বালানির এর চেয়ে বড় অপচয় আর হতে পারে না।

এ বই লেখার সময় মার্ক মাইলিস নাসার ব্রেকথ্রু প্রোপালসন প্রোজেক্টের প্রধান ছিলেন। তাঁর আশা ছিল, শূন্যের ভৌত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এ অসুবিধা দূর করা যাবে। তবে দূর্ভাগ্যজনক কথা হলো, নিকট ভবিষ্যতে ব্ল্যাকহোলের শূন্য ও সিঙ্গুলারিটি নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। প্রথম কথা হলো, ওয়ার্মহোলের জন্য প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত সিংগুলারিটি তৈরি করাই সীমাহীন কঠিন কাজ। তার ওপর, এমন সিংগুলারিটি অভিযাত্রী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। ১৯৯৮ সালে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিদ এ বিষয়ে একটি কাজ করেন। তাঁরা দেখান, ভর স্ফীতির কারণে সুন্দর বলয় আকৃতির সিংগুলারিটির একটি ঘূর্ণয়মান বা চার্জধারী ব্ল্যাকহোলও মহাকাশচারীকে হত্যা করবে। সিংগুলারিটির দিকে যেতে থাকলে ব্ল্যাকহোলের ভর বেড়ে অসীমের কাছাকাছি হবে বলে মনে হবে। মহাকর্ষীয় টান হবে ভয়ানক শক্তিশালী। এক সেকেন্ডের ভগাংশ সময়েই মহাকাশচারী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ওয়ার্মহোল স্বাস্থ্যের মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস।

মহাকাশ ভ্রমণের জন্য ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রের শূন্য সহজ কোনো পথ তৈরি করে না। তবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শূন্য বিকল্প একটি দরজা খুলে দিয়েছে। শূন্য-বিন্দুর শক্তিই হয়তোবা পরম জ্বালানি। এখানে এসে পদার্থবিদ্যার মূল ধারা ছেড়ে আমরা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করছি।

মাইলিসের মতে মহাকাশচারীরা যানকে ঠেলে নেওয়ার জন্য ভ্যাকুয়ামের শক্তি কাজে লাগাতে পারেন। নাবিক যেভাবে বাতাস কাজে লাগিয়ে জাহাজ চালান। তিনি বলেন, "আমি কাজিমির প্রভাবের সাথে একটু তুলনা দিচ্ছি। প্লেটকে পাশাপাশি রেখে আমরা ভ্যাকুয়াম থেকে দৃশ্যমান বিকিরণ চাপ পাচ্ছি। এখান থেকে কোনোভাবে অপ্রতিসম (দ্বিমুখীর বদলে একমুখী) বল পাওয়া গেলে অগ্রসরমান বল পাওয়া যাবে।" দুঃখজনকভাবে, এখন পর্যন্ত কাজিমির প্রভাবকে প্রতিসমই মনে হচ্ছে। দুই প্লেট কাছে আসে ও একে অপরকে আকর্ষণ করে। একের ক্রিয়া অপরের প্রতি সমান ও বিপরীতমুখী। কোনো ধরনের কোয়ান্টাম পাল থাকলে কাজটা সহজ হত। যেটা হত একমুখী দর্পণের মতো। একপাশের ভার্চুয়াল কণাকে যা প্রতিফলিত করত। কিন্তু অপর পাশ দিয়ে চলে যেতে বিনা বাধায়। ভ্যাকুয়াম শক্তি তখন পুরো বস্তুটাকে অপ্রতিফলিত পালের দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। মাইলিস স্বীকার করছেন, এটা করার কোনো উপায় কারও মাথায় আসছে না। এমন একটি যন্ত্র তৈরি করার মতো কোনো তত্ত্ব নেই।

আসল সমস্যা হলো পদার্থবিদ্যার সূত্র আপনাকে বিনামূল্যে কিছু পেতে দেবে না। জাহাজ যেভাবে বাতাসের গতি কমিয়ে দেয়, তেমনি কোয়ান্টাম পালকেও ভ্যাকুয়ামের শক্তি কমাতে হবে। কিন্তু শূন্যতাকে কীভাবে আপনি বদলাবেন।

হ্যারল্ড পুটহফ অবশ্য আশা ছাড়তে নারাজ। ভদ্রলোক টেক্সাসের অস্টিনে অবস্থিত ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। কোয়ান্টাম পাল ভ্যাকুয়ামের বৈশিষ্ট্যকে বদলে দেবে। (১৯৭৪ সালে নেচার জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে পুটহফ বিখ্যাত হন। তাঁর গবেষণা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, যাদুকর উরি গেলার ও অন্য পদার্থবিজ্ঞান চোখের সাহায্য ছাড়াই দূর থেকে বস্তুকে দেখতে পারে। এ সিদ্ধান্ত মূল ধারার বিজ্ঞান গ্রহণ করেনি।) তিনি বলেন, "ভ্যাকুয়াম ক্ষয় হয়ে একটু নিম্ন অবস্থায় নেমে আসে।" যদি তাই হয়, তাহলে কোয়ান্টাম পাল সূচনা মাত্র। এমন ইঞ্জিনও বানানো যাবে, যা চলবে শুধু শূন্য-বিন্দুর শক্তি দিয়েই। এদের একমাত্র অসুবিধা হলো মহাবিশ্বের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। যদিও কাজটা হবে ধীরে। কাঠামোর মধ্যে কখনও গর্ত তৈরি হবে না। পুটহফের মতে, "এটা মহাসমুদ্র থেকে এক কাপ পানি নেওয়ার মতো ঘটনা।"

এটা মহাবিশ্বকে ধ্বংসও করে দিতে পারে। ভ্যাকুয়ামের শক্তি আছে—এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাজিমির বলই তার স্বাক্ষী। কিন্তু ভ্যাকুয়ামের শক্তিই কি সত্যিকার অর্থে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য শক্তি। তা নাহলে কিন্তু ভ্যাকুয়ামের মধ্যেই বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। ১৯৮৩ সালে দুজন বিজ্ঞানী নেচার সাময়িকীতে বলেন, ভ্যাকুয়াম নিয়ে কারসাজি করতে গেলে মহাবিশ্ব আত্মহনন করতে পারে। সে গবেষণায় বলা হয়, আমাদের ভ্যাকুয়াম হয়তোবা নকল ভ্যাকুয়াম। হয়তোবা এটা আছে অস্বাভাবিক তেজস্বী অবস্থায়। পাহাড়ের পাশে ঝুঁকিপূর্ণভাবে একটি বল রেখে দেওয়ার মতো অবস্থা। ভ্যাকুয়ামকে যথেষ্ট দুলুনি দিলে হয়ত পাহাড় বেয়ে সেটা নামতে শুরু করবে। ঠাঁই নেবে আরও নিম্বশক্তির কোনো অবস্থায়। আমরা সেটা থামাতে পারব না। এতে করে অবমুক্ত হবে শক্তির এক বিশাল বুদ্বুদ। যা প্রসারিত হবে আলোর গতিতে। পেছনে রেখে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। এটা এতটাও খারাপ হতে পারে যে এমনকি আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বিপর্যয়ের সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তবে এটা ঘটা সম্ভাবনা অনেক অনেক কম। আমাদের মহাবিশ্ব টিকে আছে বহু বিলিয়ন বছর যাবত। আমরা এমন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকব তার সম্ভাবনা খুব কমই। এমন একটি বিপর্যয় সম্ভব হয়ে থাকলে তা ঘটানোর জন্য মহাজাগতিক রশ্মির সাথে সঙ্ঘর্ষই যথেষ্ট ছিল। তবে এ যুক্তি বিশ্বাসীদের দমাতে পারেনি। তাদের মধ্যে আছেন পদার্থবিদও। ফার্মিল্যাবের মতো উচ্চশক্তির পরীক্ষাগারের গবেষণা প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, উচ্চশক্তির সংঘর্ষে ভ্যাকুয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন শুরু হবে। এসব ভাবনাগুলো সঠিক হলেও শূন্য-বিন্দুর শক্তি দিয়ে মহাকাশযানকে ঠেলে নিতে পারার সম্ভাবনা সামান্য। তবে পুটহফের বিশ্বাস, তাঁর কাছে শূন্যতার শক্তি সংগ্রহের উপায় আছে।

তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা কাজিমির প্রভাব থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন। এমনকি ভ্যাকুয়ামের সবচেয়ে নিষ্প্রভ বিন্দু পরম শূন্য থেকেও। দুই প্লেটের সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। সে তাপকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা যায়। তবে দুই প্লেটকে আলাদা করতে গেলে আগের উৎপাদিত শক্তির চেয়ে বেশি শক্তি খরচ হয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, এ ঘটনাই শূন্যস্থানের শক্তি দিয়ে বানানো অবিরাম গতি যন্ত্রের ধারণাকে বাতিল করে দেয়। তবে পুটহফ মনে করেন, এ সমস্যার বেশ কিছু সমাধান আছে তাঁর কাছে। একটি উপায় হলো প্লেটের বদলে প্লাজমার ব্যবহার।

প্লাজমা হলো চার্জিত কণা দিয়ে তৈরি গ্যাস। কাজিমির প্রভাবের ক্ষেত্রে এটা আচরণ করবে ধাতব প্লেটের মতোই। সিলিন্ডার আকৃতির একটি পরিবাহী গ্যাসকে শূন্য-বিন্দুর ফ্লাকচুয়েশন বা ওঠানামা দিয়ে সঙ্কুচিত করা হবে। ঠিক যেভাবে প্লেটকে বলপ্রয়োগে একত্র করা হয়। এ সঙ্কোচন প্লাজমাকে উত্তপ্ত করবে। নির্গত হবে শক্তি। পুটহফের মতে, ধাতব প্লেটের চেয়ে প্লাজমা বানানো সহজ কাজ। বিদ্যুতের একটি বল্টু দিয়েই তা করা যায়। প্লেটকে তো পরে আলাদা করতে হয়। সেখানে প্লাজমার "ছাই"কে উপেক্ষা করলেই হলো। পুটহফ উৎসাহের সাথে দাবি করেছেন, এ প্রক্রিয়ায় সরবরাহকৃত শক্তির ৩০ গুন ফেরত পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "এটা প্রমাণিত। এটা নিয়ে আমাদের একটা প্যাটেন্টও আছে।" তবে পুটহফের যন্ত্রও বিনামূল্যে শক্তি সরবরাহ করার বহু যন্ত্রগুলোরই একটি। অটিতে এগুলোর কোনোটাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা উতরে যেতে পারেনি। পুটহফের শূন্য শক্তির যন্ত্র আলাদা হবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা ও সার্বিক আপেক্ষিকতা বলে, শূন্যের ক্ষমতা অসীম। ফলে মানুষ এর সযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেই। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, শূন্যতা থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না।

তথ্যনির্দেশ

১। পরম শূন্য তাপমাত্রার প্রকৃত মান (-২৭৩.১৫) ডিগ্রি সেলসিয়াস।

২। বাস্তবে আসলে দুই ধরনের ঘটনাই আছে। বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন দুই ধরনের চলক আছে। যে চলক নির্দিষ্ট মানের বাইরের কোনো মান গ্রহণ করতে পারে না সেটি বিচ্ছিন্ন। যেমন একটি ক্রিকেট ম্যাচে কয়টি ছক্কা হবে? ০, ১ বা ২ বা তার বেশি। ১ ও ২-এর মাঝে কিছু নেই। দৈনিক দূর্ঘটনা বা কল সেন্টারে আসা কলের সংখ্যাও এমন বিচ্ছিন্ন। (discrete) চলক। মানুষের ওজন, উচ্চতা আবার অবিচ্ছিন্ন। কারও ওজন ৬৫.৩ কেজি যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে ৬৫. ৩১ও। এ দুই সংখ্যা বা যেকোনো দুই সংখ্যার মাঝের যেকোনো সংখ্যাই হতে পারে। এসব চলককে বলে অবিচ্ছিন্ন (continuous)।—অনুবাদক

৩। তরঙ্গ ফাংশন বুঝতে মাঝেমধ্যে একটি জিনিস কাজে আসে। (পারিভাষিক অর্থে আসলে সেটা তরঙ্গ ফাংশনের বর্গ।) এ ফাংশন হলো কণার অবস্থানের সম্ভাবনার পরিমাপ। যেমন একটি ইলেকট্রন স্থানের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত থাকে। কিন্তু অবস্থান পরিমাপ করতে গেলে তরঙ্গ ফাংশন একে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বলে দেয়। প্রকৃতির এ অনিশ্চয়তারই বিরোধিতা করেছিলেন আইনস্টাইন। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর মহাবিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন না।" এ কথার মাধ্যমে তিনি কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সম্ভাবনাভিত্তিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করেছিলেন। আইনস্টাইনের দুর্ভাগ্য! কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার সূত্র অবিশ্বাস্যরকম ভালভাবে কাজ করে। প্রচলিত চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে কোয়ান্টাম প্রভাব সফলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪। সঠিক করে বললে আসলে অনিশ্চয়তা নীতি বেগের বদলে কাজ করে ভরবেগ (momentum) নিয়ে। যা বস্তুর ভর ও বেগের গুণফল। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় গতির বদলে বেগ বললে চলাচলের দিকও বোঝায়। যেমন কোনো কিছু কি উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে চলছে। অথবা কাছে আসছে নাকি দূরে যাচ্ছে। ফলে ভরবেগের মধ্যে বস্তুর ভর, গতি ও পথের দিকের তথ্য থাকে। তবে এক্ষেত্রে ভরবেগ, গতি ও এমনকি শক্তিকেও একের বদলে অন্যকে ব্যবহার করা যায়।

৫। মৌলিকভাবে অনিশ্চয়তা নীতি বেশ কিছু জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্যই খাটে। এর মধ্যে একটি হলো অবস্থান ও ভরবেগ। আরেকটি জোড়া হলো বস্তুর শক্তি ও সময়কালের (স্থায়িত্ব) অনিশ্চয়তা। **নীতিটি বলছে, ‘শূন্য’ স্থানেও প্রচুর পরিমাণ ভার্চুয়াল কণা ও প্রতিকণার জোড়া রয়েছে। যদি তা না হত, মানে ‘শূন্য’ স্থান যদি আসলেই সম্পূর্ণ খালি হত, তাহলে তার অর্থ হত মহাকর্ষীয় এবং তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রসহ সবগুলো ক্ষেত্রের মান একেবারে শূন্য হত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রের মান ও সময়ের সাথে তার পরিবর্তনের হার একটি কণার অবস্থান ও বেগের (অবস্থানের পরিবর্তন) সাথে তুলনীয়। অনিশ্চয়তা নীতি বলছে যে আপনি এই দুটি রাশির একটিকে যত বেশি সঠিকভাবে পরিমাপ করতে চাইবেন, আরেকটিতে ভুলের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। অতএব, শূন্য স্থানের কোনো ক্ষেত্রের মান যদি পুরোপুরি শূন্য হয়, তার মানে একই সাথে এর মান (অর্থ্যাৎ শূন্য) এবং পরিবর্তনের হার (এটাও শূন্য) দুটোরই একটি সূক্ষ্ম হিসাব পাওয়া যাবে। এটি অনিশ্চয়তা নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে। অতএব, ক্ষেত্রের মানের মধ্যে কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকতেই হবে। একে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান।—অনুবাদক**

\* **আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন, এই অনুবাদকের অনূদিত *অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম* (পৃষ্ঠা ও ।)।**

**৬। ব্ল্যাকহোল থেকে কিছু বের না হলেও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েকশনের কারণেই কিছু কণা বের হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ার নাম হকিং বিকিরণ।—অনুবাদক**

**\* আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন, এই অনুবাদকের অনূদিত *অ্যা ব্রিফার হিস্ট্রি অব টাইম* (পৃষ্ঠা ।)।**

**৭। ব্যাপারটা আসলে ঘড়ির যান্ত্রিক কোনো বিষয় নয়। সময় ধীরে চলার প্রভাবটাই ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে।—অনুবাদক**

**৮। বিশেষ আপেক্ষিকতা শুধু ধ্রুব বা নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে কাজ করে। ত্বরণ ও মহাকর্ষ নিয়ে কাজ করে সার্বিক আপেক্ষিকতা।—অনুবাদক**

**৯। ব্ল্যাকহোলদের মধ্যে এখানে নাক্ষত্রিক ব্ল্যাকহোলের কথা বলা হচ্ছে। যে ব্ল্যাকহোল তৈরি হয় ভারী নক্ষত্রের জীবনের শেষে। তবে সুপারম্যাসিভ বা অতিভারী ব্ল্যাকহোল এভাবে তৈরি হয় না। এরা থাকে ছায়াপথের কেন্দ্রে। এছাড়াও কয়েক রকম ব্ল্যাকহোল আছে। তবে নাক্ষত্রিক ব্ল্যাকহোলরাই বেশি আলোচিত।**